Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

IOM

Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলাম প্রচারে নারীদের অবদান

তত্ত্বাবধায়নেঃ

আবদুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

নাসিমা পারভীন

রোলঃ ২১৫০০৬৩৫

৩ ডিসেম্বর, ২০২৩ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলাম প্রচারে নারীদের অবদান

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

আবদুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

নাসিমা পারভীন

রোলঃ ২১৫০০৬৩৫

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "ইসলাম প্রচারে নারীদের অবদান" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে নাসিমা পারভীন, আইডিঃ ২১৫০০৬৩৫ বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

আবদুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

নাম:

ডিপার্টমেন্ট:

প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, "ইসলাম প্রচারে নারীদের অবদান" শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের আবদুল ওয়াহিদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

Nasima Pervin

(স্বাক্ষর)

নাসিমা পারভীন

আইডিঃ ২১৫০০৬৩৫

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

৩ ডিসেম্বর, ২০২৩ ইং

সূচিপত্র

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা সংখ্যা
ভূমিকা	৫
ইসলামের আবির্ভাবকালে আরবে ও ভারতের নারী সমাজ	৫
মা হাজেরার অনুকরণের উপর ইসলামের ভিত নির্মিত	৭
হযরত খদিজাতুল কুবরার অবর্ণনীয় ত্যাগ	৮
হযরত আয়েশা রা. এর অনন্য সাধারণ ব্যক্তিত্ব	৯
রাষ্ট্রপ্রধানের উপদেষ্টার মর্যাদায় হযরত উম্মে সালমা (রা)	১০
হাবশায় হিজরতে মহিলাদের ভূমিকা	১২
মক্কায় মজলুম পাঁচ কৃতদাসী	১২
প্রথম মহিলা শহীদ সুমাইয়া (রা)	১৩
হযরত উমর রা. এর খুতবার প্রতিবাদ করলেন নারী	১৪
দ্বীনের দাওয়াত ও নারী	১৫
সন্তান প্রতিপালনে নারী	১৬
ঘরে সামষ্টিক দ্বীনি আলোচনায় নারীর ভূমিকা	১৭
সন্তানদের প্রশিক্ষনে নারীর ভূমিকা	১৮
ইসলামী সমাজ গড়ার আন্দোলনে নারী	২০
ইসলামী সমাজ গঠনে নারীর অবদান	২৫
সামরীকক্ষেত্রে নারীর অবদান	২৭
সরকারী কাজে নিয়োজিত ব্যাক্তিদের উপদেশ দান ও ফলাফল	২৮

ভূমিকা

ইসলাম প্রচারে পুরুষদের মতো নারীদেরও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। দ্বীন তথা ইসলামের প্রচার-প্রসারে নারীদের যথাযথ ভূমিকা পালনের মাধ্যমে মানবজীবনে পূর্ণ দ্বীন বাস্তবায়ন এবং ইহকালীন ও পরকালীন সফলতা অর্জন সম্ভব। এই পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানব রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সাহাবিদের মধ্যে পুরুষদের পাশাপাশি নারীরাও ছিল। ইসলামের দৃষ্টিতে নারীর জীবন এক মহিমান্বিত জীবন। ইসলাম ধর্ম প্রচার ও প্রসারে পুরুষদের পাশাপাশি নারীদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে যেসব নারী জীবনের মায়া ত্যাগ করে সোনালি ইতিহাস গড়ে গেছেন, তাদের অনুসৃত পথেই বর্তমানের নারীদের চলতে হবে। সে পথে চলার জন্য সম্মিলিতভাবে সব নারীকে আহ্বান করতে হবে। তাহলেই নারী জীবনে পূর্ণতা আসবে। তাই নারীদের প্রধানতম কর্তব্য হলো সমাজের বিভিন্ন মহলের নারীদের কাছে ইসলামের অমিয় বাণী পৌঁছানো, দ্বীনের আলো ছড়ানো। দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহর সন্তুষ্টি পেতে হলে দ্বীনকে প্রচারের মাধ্যমে মজবুত করতে হবে। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নতকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরতে হবে। মানুষের যাবতীয় কল্যাণ ও সফলতা আল্লাহর আদেশ পালন ও সুন্নতওয়ালা কাজের মধ্যে নিহিত।

ইসলামের আবির্ভাবকালে আরবে ও ভারতের নারী সমাজ

প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ইসলামের দাওয়াত দেন তখনকার আরব সমাজে নারীরা কতভাবে বঞ্চনার শিকার ছিল, তার চিত্র ইতিহাস সংরক্ষণ করেছে। এর সামান্য একটি নমুনা ছিল, মেয়ে শিশুর জন্মকে গোটা পরিবারের জন্য কলঙ্কজনক মনে করা হত। তাই জন্মের সাথে সাথে তাদেরকে জীবন্ত কবরে পুতে ফেলা হত। ঠিক একই সময়ে ভারতীয় সমাজে চলছিল অন্যরকম চিত্র ও নিগ্রহ। ভারতীয় সভ্যতায় নারীকে মনে করা হত স্বামীর ভোগের সামগ্রী। তাই স্বামী মারা গেলে স্ত্রীকে স্বামীর লাশের সাথে চিতায় গিয়ে আগুনে পুড়ে প্রাণ দিতে হত।

এমন পরিস্থিতিতেই মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধূলির ধরায় আবির্ভূত হন। তার প্রচারিত ইসলামের ছায়াতলে নারী তার অধিকার ও সম্মান ফিরে পায়। এ কারণে দেখা যায় নারী তার মানবিক সত্তার পূর্ণ প্রকাশ ঘটিয়ে ইসলামের প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় কালজয়ী ভূমিকা পালন করেন। মুসলিম মহিলারা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের এই দায়িত্ব উপলব্ধি করে ত্যাগ ও কুরবানীর অনেক নজির স্থাপন করে গেছেন। আল্লাহর দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা করতে যেয়ে হযরত খাদিজা (রা) তার সম্পদের সবটুকুই দিয়ে দিলেন। আল্লাহর রাসূল (সা) যে সমাজে প্রথম দাওয়াতের কাজ শুরু করেন সেই সমাজে দাওয়াত গ্রহণ করার অর্থ কি ছিলো তা সবাই জানত। অবর্ণনীয় বিপদ মুসিবতের এই সময়ে প্রথম সাক্ষ্যদানকারী হিসেবে সাড়া দেন খাদিজা (রা)। সাথে সাথে আল্লাহর রাসূলকে দেন অদৃশ্য সাহায্য লাভের আশ্বাস।

সুমাইয়া (রা) এর উপর নির্যাতনের পাহাড় ভেঙ্গে পড়লেও তিনি ছিলেন আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থাশীল। হযরত খানসা (রা) যুদ্ধের ময়দানে পুত্রদের ঠেলে দিয়েছিলেন শহীদ হওয়ার জন্য।

হযরত আসমা বিনতে আবু বকর এর কাহিনী আরো বিস্ময়কর। তিনি পুত্রকে বলেন, “তুমি জয়ী হয়ে ফিরে আসলে আনন্দিত হবো। কিন্তু তুমি আমার কোলে ফিরে না আসলেও আল্লাহর শোকর আদায় করবো।”

এভাবে শুধু নিজের জীবন দিয়ে নয়, প্রাণ প্রিয় কলিজার সন্তানকে গরম তেলের ডেকচিতে ভেজে ঈমানের সত্যতার প্রমাণ দিয়ে বাতিলের সামনে খাড়া মস্তিষ্কে বিবি আসিয়া (রা)।

হযরত সাফিয়া (রা) যুদ্ধের ময়দানে প্রাণাধিক প্রিয় ভাইয়ের লাশ দেখে মরিয়া হওয়ার পরিবর্তে মন্তব্য করেছিলেন: “আল্লাহর রাস্তায় এটা কোন বড় কোরবানী নয়।”

মা হাজেরার অনুকরণের উপর ইসলামের ভিত নির্মিত

ইসলামের যে বিশ্বজনীন ব্যবস্থা তার ভিত নির্মিত হয়েছে একজন মহিলার অবদানের উপর। ইতিহাস বলে, হযরত ইবরাহীম আ. দ্বিতীয় স্ত্রী হযরত হাজেরা আ. কে কোলের শিশু ইসমাঈলসহ রেখে এসেছিলেন জনমানবহীন মক্কার মরুপ্রান্তরে। ইব্রাহীম আ. বাস করতেন বর্তমান ফিলিস্তিনে। সেখান থেকে গিয়ে তিনি শিশু ইসমাইলকে মায়ের কোলে রেখে আসেন ঠিক সেই জায়গায়, যেখানে বর্তমানে কাবাঘর ও হেরেম শরীফ প্রতিষ্ঠিত। জনমানবহীন খাদ্য ও পানীয় শুন্য একটি মরুভূমিতে স্ত্রী ও দুগ্ধপোষ্য সন্তানকে রেখে আসা ইব্রাহীমের জন্য যতখানি অসহনীয় ছিল তার চেয়েও বিস্ময়কর ছিল হযরত হাজেরার এমন নির্বাসিত জীবন মেনে নেয়া। অথচ আল্লাহর আদেশ বলে তারা হাসিমুখে বরণ করে নেন যাবতীয় মানসিক ও দৈহিক কষ্ট। ইবরাহীম আ. এর প্রত্যয় ছিল যেহেতু এই কাজ আল্লাহর হুকুমে আঞ্জাম দিয়েছি বাকিটুকু তিনি দেখবেন।

একটি থলিতে রাখা খেজুর ও মশকের পানি ফুরিয়ে গেলে কোলের যাদুর প্রাণ নাশের আশংকায় হযরত হাজেরা অস্থির হয়ে যান। পানির সন্ধান পাবেন আশায় একবার সাফা পাহাড়ের উপর উঠেন, আবার মারওয়া পাহাড়ের দিকে দৌঁড়ে যান। মনে হয় পানি সাফা পাহাড়ের উপর টলমল করছে। আবার দৌঁড়ে সাফা পাহাড়ে গিয়ে নিরাশ হন। মনে হচ্ছে পানি মারওয়া পাহাড়ে ঝিলমিল করছে। আসলে মরুভূমির প্রখর রোদে মরিচিকার মায়াজালকে পানির অথৈ তরঙ্গ বলে ভ্রম হচ্ছিল। এভাবে হাজেরা আ. সাত বার দুই পাহাড়ের মাঝখানে দৌঁড়ান।

শেষবারে লক্ষ করেন, শিশুকে যেখানে রেখে পানির জন্য ছুটাছুটি করছেন সেখানে ইসমাঈলের পায়ের নিচ থেকে পানির ঝর্ণা উৎসারিত হচ্ছে। হাজেরা তাড়াতাড়ি সেই ঝর্ণার চারপাশে আল তুলে দেন। এই ঝর্ণাই বর্তমান যমযম কূপ। সেই কূপকে কেন্দ্র করে মক্কায় জুরহুম সম্প্রদায়ের বসতি গড়ে উঠে। কাবাঘর নির্মিত হয়। হজের প্রবর্তন হয়। তখন থেকে যত নবী রাসূল দুনিয়াতে এসেছেন, যত আলেম ওলী এসেছেন, কিয়ামত পর্যন্ত আসবেন, প্রতি বছর লাখ লাখ হাজি হজ করেন, সারা বছর ওমরা করেন, তাদের সবাইকে মহিয়সী নারী বিবি হাজেরার অনুকরণ করতে হয়। তিনি

যেভাবে দৌঁড়িয়েছেন সেভাবে সাফা মারওয়ায় সায়ী করতে হয়। তারপর মা হাজেরার স্মৃতিধন্য যমযমের পানি পান করে আমরা প্রাণ জুড়াই। ইসলামের প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় নারীদের ভূমিকার এর চেয়ে বড় উদাহরণ আর কী হতে পারে? আর নারীর প্রতি ইসলাম যে সম্মান দিয়েছে তা কি মানুষের কল্পনায় আসতে পারে?

হযরত খদিজাতুল কুবরার অবর্ণনীয় ত্যাগ

হযরত খদিজাতুল কুবরা রা. মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দাওয়াতী মিশনের জন্য যে ত্যাগ, বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন তাতে তিনি বিশ্বের বুকে আল্লাহ আল্লাহর রসূল ও তাঁর আনীত বাণীর প্রতি প্রথম বিশ্বাস স্থাপনকারীর মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়েছেন। বিশ্বের বুকে প্রথম মুসলমান একজন মহিলা এটি কি মুসলিম নারীদের জন্য কম গৌরবের বিষয়? ওহী নাযিলের আগেও হেরাগুহায় নবীজি যখন ধ্যানমগ্ন থাকতেন তখন তাঁর খাবার ও পানীয় সরবরাহ করতেন হযরত খদিজা রা.। সাধারণত মহিলারা স্বামীর আয় উপার্জনের দিকেই দৃষ্টি রাখে। অথচ স্বামীর প্রতি খদিজাতুল কুবরার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল অন্যরকম। খদিজা ছিলেন আরবের ধনাঢ্য মহিলা। তার পুঁজি নিয়েই বিবাহের আগে নবীজি সিরিয়ায় বাণিজ্যে গিয়েছিলেন। কিন্তু বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পর নিজের সমস্ত সম্পদ তিনি উৎসর্গ করেন নবীজির কদমে। তাঁর গোটা জীবন, জীবনের সবকিছু বিলিয়ে দিয়েছিলেন ইসলামের সেবায় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্যে। ইসলামের জন্য হযরত খদিজার আত্মত্যাগ কতখানি তা বুঝার জন্য একটি হাদীসের মর্মবাণী সামনে রাখাই যথেষ্ট। হযরত আয়েশা রা. বর্ণনা করেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখনই খদিজার কথা স্মরণ করতেন তাঁর প্রশংসা করতেন। এবং এই প্রশংসা হত অনেক দীর্ঘ ও সুন্দর। একদিন খদিজার অতিবেশি প্রশংসা শুনে আমার আত্মমর্যাদায় লাগল। আমি নবীজিকে বলে ফেললাম, আপনি একজন বুড়ির প্রশংসায় এভাবে আত্মহারা হয়ে যান। সে তো মরে গেছে আর আল্লাহ আপনাকে তার চেয়ে অনেক উত্তম স্ত্রী দান করেছেন। একথা শুনে নবীজি বললেন, হে আয়েশা! আল্লাহ আমাকে খাদিজার চেয়ে উত্তম স্ত্রী দান করেন নি।

(খাদিজার চেয়ে উত্তম কেউ হতে পারে না। কেননা, মানুষ যখন আমাকে অস্বীকার করেছিল তখন সে আমার উপর ঈমান এনেছিল। লোকেরা যখন আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল খাদিজা তখন আমাকে সত্য বলে বিশ্বাস করেছিল। মানুষ যখন আমাকে বঞ্চনার শিকার করেছিল তখন আল্লাহর তার সম্পদ দিয়ে আমাকে অভাবমুক্ত করেছিল। আর আল্লাহর তার ঘরে আমার সন্তানদের দিয়েছেন (ইবরাহীম ছাড়া বাকী সবাই খদিজার ঘরের সন্তান) ।

হযরত আয়েশা রা. এর অনন্য সাধারণ ব্যক্তিত্ব

আমাদের মা হযরত আয়েশা রা. কে নবীজি আদর করে ডাকতেন হুমায়রা। তবে আসল নাম আয়েশা। সিদ্দিকা ছিল তার উপাধি। এই উপাধি পিতা আবু বকর আতীক ইবনে আবি কুহাফা সূত্রে প্রাপ্ত। তার উপাধি ছিল সিদ্দিক (পরম সত্যবাদী) । তিনি ইসলামের প্রথম খালিফা ও পয়গাম্বর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পর সর্বাধিক সম্মানের পাত্র। হযরত আয়েশা রা. এর বয়স যখন ৬ বছর, তখন হিজরতের দুই বছর পূর্বে রাসূলে আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে তাকে বিয়ে দেন আবু বকর সিদ্দিক রা.। দ্বিতীয় হিজরীতে তিনি হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সংসারে গমন করেন। তখন তার বয়স হয়েছিল ৯ বছর। তিনি ছিলেন অন্যান্য বিবিগণের মাঝে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে সর্বাদিক প্রিয়। এ কারণে পালাক্রমে যেদিন হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ঘরে থাকতেন, সেদিন সাহাবায়ে কেরাম হযরতের কাছে হাদিয়া উপহার বেশি পাঠাতেন। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়েশার ঘরে ও তাঁর কোলে ওফাত লাভ করেন। সেই ঘরেই তিনি সমাহিত হন। সে ঘরই এখন রওযা আকদাস হিসেবে দুনিয়ার মুসলমানদের কাছে সবচে প্রিয় স্থান। হযরত আয়েশা রা. সূত্রে হাদীসের জ্ঞান ছাড়াও মহিলা সংক্রান্ত শরীয়তের অনেক বিধান লাভ করে মুসলিম উম্মাহ। তবে সবচে বড় অবদান ছিল তিনি ছিলেন নবীজির মনের সান্ত¦না। কোনো ব্যস্ততা বা আধ্যাত্মিক ভাবের তন্ময়তায় যখন নবীজির মন ভারি হয়ে যেত তখন মনের সান্তনার খুঁজে হযরত

আয়েশাকে ডেকে বলতেন: কাল্লিমীনী ইয়া হুমাইরা। ‘হে হুমায়রা তুমি আমার সাথে কথা বল, আমার মন হলকা কর’ নবুয়তের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে একজন মহিলার এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার দৃষ্টান্ত আর কি হতে পারে? বর্ণিত আছে, নবীজি যখন একই বিছানায় একই চাদরের নিচে হযরত আয়েশার ঘরে বিশ্রাম নিতেন তখনও তার উপর ওহী নাযিল হত। হযরত আয়েশা রা. এর প্রচুর কবিতা মুখস্থ ছিল। অর্থাৎ সাহিত্য চর্চায় তিনি অগ্রণি ছিলেন। এছাড়া তিনি রোগীদের চিকিৎসা করতেন। মানুষ চিনতে তার মেধা ও প্রজ্ঞা ছিল অত্যন্ত প্রখর। তিনি ইসলামের প্রথম শ্রেণীর আলেম ও ফকীহ ছিলেন। সাহাবীদের মধ্যে যে ৭ জন ফিকাহশাস্ত্রে শিরোমণি ছিলেন, হযরত আয়েশা রা. তাদের অন্যতম। সেই ৭ জন ছিলেন হযরত উমর রা., হযরত আলী রা, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মসউদ রা., হযরত আয়েশা রা. হযরত যায়দ ইবনে সাবেত রা., হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. ও হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. । বাকী ১৩৩ বা ১৩৯ জন ফকীহ সাহাবীর অবস্থান এই ৭ জনের পরে। হযরত আয়েশা রা. হতে ২ হাজার ২শ ১০ টি হাদীস বর্ণিত। হযরতের জীবদ্দশায় ও ওফাতের পরে নানা ঘটনা প্রবাহে হযরত আয়েশা রা. মূখ্য ভূমিকা পালন করেন। হযরত ওসমান রা. এর খেলাফতের শেষদিকে উটের যুদ্ধে তিনি অগ্রণি ভূমিকা পালন করেন। কিন্তু তার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। এ নিয়ে তিনি মৃত্যু পর্যন্ত মনস্তাপে ভুগেছেন। তিনি ৫৭ বা ৫৮ হিজরীতে ওফাত লাভ করেন এবং মদীনার কবরস্থান বাকীতে সমাহিত হন।

রাষ্ট্রপ্রধানের উপদেষ্টার মর্যাদায় হযরত উম্মে সালমা (রা)

উম্মহাতুল মুমেনীনদের মধ্যে জাতীয় জীবনের জটিল সমস্যা সমাধানে যে ভূমিকা পালন করেছিলেন তার কারণে তাকে ইসলামে রাষ্ট্রপ্রধানের উপদেষ্টার মর্যাদায় স্মরণ করা হয়। নবীজি মক্কা অভিযানের উদ্দেশ্যে ১৪০০ সাহাবীর বিরাট বাহিনী নিয়ে মদীনা থেকে মক্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলেন। হুদায়বিয়া নামক স্থানে পৌঁছে তিনি জানতে পারেন কুরাইশরা তাকে মক্কা প্রবেশ ও উমরা পালন করতে দেবে না। তিনি আলোচনার জন্য মক্কার ধনাঢ্য ব্যক্তি হযরত উসমানকে পাঠান। ঘটনা প্রবাহের মধ্য দিয়ে কুরাইশদের

সাথে শান্তিচুক্তি হয়। কিন্তু বাহ্যত এই চুক্তি ছিল মহানবী ও মুসলমানদের জন্য অবমাননাকর। শান্তির স্বার্থে ও ভবিষ্যতের বৃহত্তর সুফলের আশা নিয়ে নবীজি এই চুক্তি স্বাক্ষর করেন। চুক্তির শর্ত ও চুক্তি স্বাক্ষরকালে মক্কার মুশরিকদের ঔদ্ধত্বপূর্ণ আচরণে মুসলমানরা ভীষণ ক্ষিপ্ত ছিল। বিপুল সংখ্যক জানবাজ যোদ্ধা সঙ্গে থাকা সত্ত্বেও মহানবীর পক্ষ হতে মুশরিকদের অযৌক্তি সব শর্ত মেনে নেয়াকে সহজভাবে মেনে নিতে পারছিল না, হযরত উমর রা. এর মত বিশাল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন সাহাবীও। শেষ পর্যন্ত চুক্তি স্বাক্ষর হল। শর্ত অনুযায়ী মুসলমানরা উমরা পালন না করেই ফেরত যাবে। মক্কার হেরেমে কুরবানীর জন্য যেসব পশু তারা সাথে এনেছিল সেগুলো হুদায়বিয়াতেই যবাই করতে হবে। এখানেই উমরার ইহরাম খুলতে হবে। নবীজি সাহাবীদের উদ্দেশ্যে ঘোষণা দিলেন, তোমরা কুরবানীর পশু জবাই কর। মাথার চুল ছেঁটে ফেল। ইহরাম খুলে স্বাভাবিক হয়ে যাও। কিন্তু আশ্চর্য যে, যারা নিজের জান বাজি রেখে হযরতের নির্দেশে প্রাণ দিতে হুদাইবিয়া প্রান্তর পর্যন্ত এসেছেন, তারা এখন হযরতের আদেশ পালনে তৎপর হচ্ছেন না। নবীজি তার আদেশটি তিনবার ঘোষণা করলেন। কিন্তু কেউ আদেশ পালনে অগ্রসর হয় না। এ অবস্থা দেখে নবীজি চিন্তিত মনে তাঁবুতে ঢুকে উম্মে সালামাকে লোকদের অবস্থার কথা জানালেন। নেতৃত্বের আনুগত্য ও প্রশাসনিক দৃষ্টিকোণ থেকে এর চেয়ে গভীর ও জটিল সংকট আর কিছু হতে পারে না। এই সংকট সমাধানে প্রচন্ড আত্মবিশ্বাস নিয়ে এগিয়ে এলেন নবীজির যোগ্য সহধর্মীনী আমাদের মা উম্মে সালামা। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি চান যে তারা আপনার আদেশ পালন করুক। তাহলে আপনি তাদের কারো সাথে একটি কথাও বলবেন না। শুধু সবার সামনে গিয়ে আপনার উটনীটি নহর (জবাই) করুন। তারপর আপনার নাপিতকে ডেকে আপনার মাথা মুড়ানোর ব্যবস্থা করুন। এই পরামর্শ পেয়ে নবীজি তাঁবু হতে বের হলেন এবং কারো সাথে কোনো কথা না বলে নিজের উটনী নহর করলেন। তারপর নাপিত ডেকে মাথা মু-ন করলেন। লোকেরা যখন এই দৃশ্য দেখল, সবাই তাদের কুরবানীর পশু নহর করল। একজন আরেকজনের মাথা মুন্ডন শুরু করল। এতক্ষণ তারা ভাবছিল যে, মুশরিকদের সাথে দৃশ্যত

অবমাননাকর চুক্তি হয়ত পুনর্বিবেচনা হবে, পশু জবাই ও মাথা মুন্ডনের জন্য নবীজির আদেশ পালনে তাই তারা ইতস্তত করছিল। কিন্তু যখন প্রমাণ হল যে, নবীজি তাঁর সিদ্ধান্ত ও আদেশের ব্যাপারে অবিচল তখন তারা সেই আদেশ পালনে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। বস্তুত জাতীয় জীবনের সমস্যা সমাধানে হযরত উম্মে সালমার এই বিচক্ষণতা ও ভূমিকা মুসলিম মহিলাদের জন্য সামাজ ও জাতীয় জীবনের সমস্যা সমাধানে অবদান রাখতে আলোকবর্তিকা হিসেবে কাজ করছে।

হাবশায় হিজরতে মহিলাদের ভূমিকা

উপরে আমরা চারজন উম্মুল মুমিনীনের ভূমিকার উপর সংক্ষেপে আলোকপাত করেছি। এর বাইরে সাধারণ মুসলিম মহিলারাও দ্বীনী দায়িত্ব পালনে যে ভূমিকা পালন করেছেন তা অনেক বিস্তর ও গৌরবজনক। নবুয়াতের ৫ম বর্ষে মক্কায় যখন মুশরিকদের আত্যাচার নির্যাতন চরম আকার ধারণ করেছিল তখন নবীজির আদেশে দুই দফায় মুসলমানরা হাবশায় হিজরত করেন। দেখা যায় দেশত্যাগের কঠিন কষ্ট যারা মাথায় নিয়েছিলেন তাদের মধ্যে বিশ জনের মত ছিলেন মহিলা। ইসলামের জন্যে প্রথম যুগের মুসলিম মহিলাদের এই আত্মত্যাগ প্রমাণ করে যে কোনো পরিস্থিতিতে ইসলামের জন্য ত্যাগ স্বীকার করতে মুসলিম মহিলারা পিছপা হন নি।

মক্কায় মজলুম পাঁচ কৃতদাসী

আবু বকর সিদ্দিক রা. মক্কায় যারা আল্লাহর পথে আসার কারণে নির্যাতিত হচ্ছিল তাদের মধ্যে সাতজন পুরুষ ও পাঁচজন মহিলাকে মুক্তি দান করেন। পুরুষদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন বেলাল ইবনে রেবাহ ও আমের ইবনে ফাহির, যাকে গারে সৌরে আত্মগোপন অবস্থায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গুহায় আসা যাওয়ার ব্যাপারে নিজের জন্য নিরাপদ মনে করেছিলেন। তিনি মদীনায় হিজরত করেন এবং বী'রে মাউনার হত্যাকান্ডের সময় তিনি শাহাদত বরণ করেন। পাঁচজন মহিলার মধ্যে ছিলেন

হযরত নাহদিয়া ও তাঁর মেয়ে, উম্মে উমাইস ও বনি আমর ইবনে মুআম্মাল এর দাসী ও যুনাইরা। বর্ণিত আছে, যুনাইরা ছিলেন দুর্বল দৃষ্টিশক্তির একজন মহিলা। তিনি ইসলাম গ্রহণের পর শায়বা ইবনে রাবিয়া, উতবা ইবনে রাবিআ ও উমাইয়া ইবনে খালাফ প্রমূখ কুরাইশ নেতা দলবলসহ তাকে নিয়ে হাসিঠাট্টা করত। তাকে বসিয়ে নানা কথা বলে হাসাহাসি করত। তারা বলত যে, আল্লাহর কসম, মুহাম্মদ যে ধর্ম নিয়ে এসেছে তা যদি ভাল হত তাহলে যুনাইরা আমাদের পেছনে ফেলে সেদিকে যেতে পারত না। এ মর্মে কুরআনের একটি আয়াত নাযিল হয়। এক সময় যুনাইরার দৃষ্টিশক্তি সম্পূর্ণ চলে গেল। তখন কুরাইশের নেতারা বলতে লাগল, তুমি লাত ও ওজ্জার ধর্মের বিরোধীতা করেছ; এ জন্যে লাত ও ওজ্জা তোমার দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নিয়েছে। যুনাইরা তাদের জবাবে বলতেন, না, আল্লাহর কসম, তারা আমার কোনো ক্ষতি করে নি এবং আমার কোনো ক্ষতি করার শক্তি ওদের নাই। পরবর্তীতে আল্লাহ তাআলা তার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন।

প্রথম মহিলা শহীদ সুমাইয়া (রা)

ইসলামের জন্য পুরুষদের পাশাপশি মহিলাদের আত্মত্যাগের কাহিনী বড়ই করুণ। হযরত সুমাইয়া রা. ছিলেন আবু হুযাইফার বাঁদী। ইয়াসের তাঁর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তাদের ঘর আলোকিত করে আম্মার নামক ছেলে সন্তান। আম্মার রাসূলুল্লাহর আহ্বানে সাড়া দিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর দাওয়াত পেয়ে তাঁর পিতা ইয়াসের এবং পরে মা সুমাইয়া ইসলামের ছায়ায় আশ্রয় নেন। অত্যন্ত করুণ ও কঠিন অবস্থায় এই পরিবার নবীজির প্রতি ঈমান আনয়ন করে। মুশরিকরা এই দুর্বল পরিবারটির উপর তাদের নৃশংসতার মাত্রা পরীক্ষা করে। মুশরিকরা ইয়াসির পরিবারের উপর চরম নির্যাতন চালিয়ে অন্যদের কাছে এই বার্তা দিতে চেয়েছিল যে, মুহাম্মদের ধর্ম গ্রহণ করলে এ রকম মাসুল গুণতে হবে। সুমাইয়ার উপর তারা যে নির্যাতন চালায় তা ছিল লোমহর্ষক, অবর্ণনীয়। বলা হয়েছে, সুমাইয়ার দুই পা দুই উটের সাথে বেঁধে উট দুটিকে বিপরীত দিকে ধাবড়ানো হয়। আরো বর্ণিত আছে, মুশরিকরা হযরত

সুমাইয়ার লজ্জাস্থানে বর্শা ঢুকিয়ে তাকে শহীদ করেছিল। ইসলামের প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় মহিলাদের এই ত্যাগ ও ভূমিকা আজকের বিশ্বের মুসলিম মহিলাদের জন্য গৌরবের।

হযরত উমর রা. এর খুতবার প্রতিবাদ করলেন নারী

নারী পুরুষের সম্মিলিত প্রয়াসে ইসলাম দেশে দেশে বিজয় ও বিস্তার লাভ করেছে। ইসলামের স্বর্ণালী যুগে কখনো মহিলাদেরকে অন্তপুরের অবরোধবাসীনী হয়ে নির্বিকার করে রাখা হয় নি। সমাজ জীবনে তাদের সক্রিয় ভূমিকার একটি উদাহরণ হযরত উমর রা. এর খেলাফতকালের একটি ঘটনা। হযরত উমর রা. মসজিদে খুতবা দিচ্ছিলেন। মহিলাদের নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিলেন। সামাজিক শান্তি ও স্থিতিশীলতার জন্য বিয়েকে সহজ করার পরামর্শ দিচ্ছিলেন। বলছিলেন যে, বিয়েকে সহজ করতে হলে বিরাট অঙ্কের মোহরানার প্রবণতা ছাড়তে হবে। জুমার নামাযে উপস্থিত একজন মহিলা দাঁড়িয়ে গেলেন। খলিফার বক্তৃতার প্রতিবাদ করে বললেন, কুরআন মাজিদে আল্লাহ তাআলা মহিলাদেরকে বিরাট অঙ্কের মোহরানার ব্যবস্থা রেখেছেন। কাজেই আল্লাহ যেখানে আমাদেরকে বিরাট অঙ্কের মোহরানা দেয়ার কথা বলেছেন সেখানে তা কেড়ে নেয়ার আপনি কে? চিন্তা করা যায়, ভরা মসজিদে খলিফার ভাষণের সরাসরি প্রতিবাদ করছেন একজন মহিলা। বিশেষজ্ঞগণ এই ঘটনাকে মুসলিম মহিলাদের পার্লামেন্ট সদস্য হওয়ার পক্ষে দলীল হিসেবে উপস্থাপন করেন। সমাজের বৃহত্তর আঙ্গিনায়, জাতীয় জীবনে, সাহিত্য সংস্কৃতিতে, শিক্ষা ও চিকিৎসায় এমনকি যুদ্ধের ময়দানে মুসলিম মহিলাদের অবদান ইতিহাসের পাতায় চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছে। ইসলাম প্রতিষ্ঠায় সকল নারীর অবকদানকে আমরা শ্রদ্ধারসাথে স্মরণ করছি।

দ্বীনের দাওয়াত ও নারী

দীন ইসলাম পুরুষ ও নারী উভয়কে ঈমান আনার দাওয়াত দেয়। ঈমানী দায়িত্ব উভয়েরই সমান। দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অংশ নেয়ার জন্য ইসলাম উভয়কে সমভাবে আহবান জানায়। ঈমান আনা, ঈমানের দাবী অনুযায়ী আমল করা এবং রাব্বুল আলামীনের সম্মুখে নিজের যাবতীয় কর্ম জবাবদিহী করার ব্যাপারে উভয়ই সমান। পরকালে না একজন অপরজনকে মুক্তির কারণ হতে পারবে না একজনের খেদমতের কথা উল্লেখ করে আরেকজন নিস্কৃতি পাবে। পরকালে মহাপরাক্রমশালী মালিক আল্লাহর নিকট ক্ষমা ও মুক্তি পাওয়ার জন্য নারী পুরুষ উভয়কেই সমানভাবে কাজ করতে হবে। পরষ্পরের সহযোগিতা করে নিজেদের নেক আমল বৃদ্ধি করতে হবে।

পরকালে মহাপরাক্রমশালী মালিক আল্লাহর নিকট ক্ষমা ও মুক্তি পাওয়ার জন্যে নারী পুরুষ উভয়কেই তৎপর হতে হবে। পরস্পরের অবস্থাতেই সম্ভব নয়। আল্লাহর সামনে নিজের আমলের জবাবদিহী করা একান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার। এ ব্যাপারে কেউই কারো সাহায্য করতে পারবেনা। কেউ কারো প্রতি অভিযোগ আরোপ করে রক্ষা. পাবেনা। কোনো প্রকার লেন-দেনের দ্বারাও কেউ নিষ্কৃতি পাবেনা । মালিকের পক্ষ থেকে অর্পিত দায়িৎসমূহ পূর্ণ আনুগত্য ও আন্তরিকতার সাথে পালন করাই আল্লাহর প্রতিটি দাস ও দাসীর কাজ। এ দায়িত্ব পালনে কোনো প্রকার কমতি করার অধিকার কারো নেই। সেগুলো মালিকের পক্ষ থেকে তাদের উপর ব্যক্তিগত পর্যায়ে অর্পিত হয়ে থাকুক কিংবা সামষ্টিক পর্যায়ে । আল্লাহ তায়ালা ইয়া আইউহান্নাস' বলে তার বন্দেগী ও দাসত্রে প্রতি আহ্বান করেন। এ আহ্বানে নারী ও পুরুষের মধ্যে কোনো তফাত নেই। ঈমানদারদের তিনি; "ইয়া 'আইউহাল্লাধীনা আ-মানু", ঘলে সম্বোধন করে তাদের উপর দায়িত্ অর্পণ করেন্। এতেও নারী পুরুষের মধ্যে কোনো পার্থক্য তিনি করেননি । তাই, দীনকে বিজয়ী ও প্রতিষ্ঠিত করার দায়িত্ কেবলমাত্র, পুরুষের উপর-এ ধারণা মগজ থেকে ধুইয়ে মুছে ফেলতে হবে ।' এ ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করা কোনো মুসলমানের জন্যে দুরস্ত নেই। পুরুষদের-দীনি দায়িত্ব পালনই যদি নারীদের জন্যে যথেষ্ট হতো তবে হযরত নূহ (আঃ) যে শত শত বছর যাবৎ দাওয়াতে দীনের কাজ করেছেন তা তার

স্ত্রীকে নাজাত দিতে পারতো । কিন্তু কুরআন সাক্ষ্য-স্বামীর দীনি কাজ তাকে রক্ষা করতে পারেনি। দীনি দায়িত্ব পালনে হয়রত লূত (আঃ) হাজারো. কষ্ট মুসীবত সহ্য করেছেন কিন্তু এতে করে তীর বিদ্রোহী স্ত্রী নিস্কৃতি পায়নি। এমনি করে পুরুষদের ঘাড়ে দায় দায়িত্ চাপিয়ে দিয়ে যদি নারীর নিষ্পত্তিই পেতো, তবে. ফেরাউনেয় স্ত্রীর কি প্রয়োজন ছিলো হাজারো বিপদ-সুসীবত মাথায় তুলে নিয়ে দীনের প্রতি প্রকাশ্য আনুগত্য প্রকাশ করার? আসল কথা, প্রত্যেক মুসলমান পুরুষের. জন্য যেমন নিজের পরকালের চিন্তা. করা প্রয়োজন, তেমনি করে নারীদের পরকালের চিন্তা তাদেরকেই করতে হবে। নারীদের দীনি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের কাজ তাদের নিজেদেরই করতে হবে। তাদের দীনি সমস্যাবলীর সমাধানও তাদের নিজেদেরকেই করতে হবে। কুরআন মজীদে আল্লাহ্ তায়ালা দোযখের আগুন থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য প্রত্যেকের নিজের দায়িত্ব নিজের উপর অর্পন করেছেন।

সন্তান প্রতিপালনে নারী

পুরুষদের চাইতে নারীদের দায়িত্ব অনেক বেশী। কারণ বাপের তুলনায় মায়ের প্রভাৰই সন্তানদের উপর বেশী পড়ে থাকে । তাদের ছোট মাথায় মায়ের প্রভাবই প্রথমে প্রতিষ্ঠিত হয়। যেমন গাছের ছোট একটি চারার কোনো অংশে যদি কেউ কোনো নকশা 'একে দেয়; তবে চারাটি বৃদ্ধির সাথে সাথে নকশাটিও বৃদ্ধি হয়ে থাকে. এমনি শৈশবে ও কৈশরে মায়েরা শিশুদের মন-মগজে ম্বে নকশাই, একে দেন তাদের বয়োঃপ্রাপ্তির সংগে সংগে তা-ই বিকশিত ও প্রস্ফুটিত-হুতে থাকে। সে নকশাই তাদের ব্যক্তিত্ব উপর প্রভাব ফেলে থাকে । তাছাড়া পিতা-মাতার মধ্যে কোনো দীনি দুর্বলতা থাকলে সন্তানদের চরিত্রেও সে দুর্বলতা প্রতিফলিত হয়ে থাকে । সাধারণত মাতা-পিতার সৎগুণের চাইতে দুর্বলতাকেই সন্তানেরা বেশী করে গ্রহণ করে থাকে । সে জন্যে মাতা বা পিতার মধ্যে. যদি দীনি দুর্বলতা এবং নৈতিক উদ্দাসীনতা থাকে, তবে তার সন্তানরা সাধারণত এ ভুলের উত্তরাধিকারী হতে বাধ্য । স্থামী-নারী উভয়ই যদি পরস্পরের আচ্ছাদন হবার দায়িত্ পালন না করে, একে অপরের দোষত্রুটি দূর করার চেষ্টা না

করে, ইয্যত আবরু ও চরিত্রের হেফাযত না করে- তবে এসব অপরাধ ও দোষ-ত্রুটি সন্তানদের মধ্যে সংক্রামিত হয়েই থাকে । পরনিন্দা, কুভাষণ এবং পারস্পরিক ঝগড়া-বাটি দ্বারাও সন্তানের মধ্যে অপরাধ প্রবণতা দেখা দেয়। পক্ষান্তরে মাতা-পিতার বিশেষ করে মাতার প্রতিটি সুভাষণ ও সদাচারই সন্তানের পক্ষে চির-জীবনের জন্যে একেকটি মহান শিক্ষায় পরিণত হয়। মাতাই হলেন সন্তানের প্রথম ও প্রধান শিক্ষয়িত্রী । একজন মুসলিম মাকে তার এ দায়িত্ব অবশ্যই পালন করতে হবে।

ঘরে সামষ্টিক দ্বীনি আলোচনায় নারীর ভূমিকা

এ পর্যায়ে ঘরে নিয়মিতভাবে সমষ্টিগত দীনি আলোচনা পরিবার-পরিজনের নৈতিক প্রশিক্ষণে দারুন উপকারী । যদি সংসারের অন্যান্য নিয়মিত কাজের ন্যায় প্রতিদিন ফজর বা এশা বাদ পরিবারের সকলকে নিয়ে বসে দু'একটা আয়াতে কুরআনের তাফসীর কিংবা হাদিসের ব্যাখ্যা আলোচনা করা যায়, তবে সন্তানদের নৈতিক চরিত্র কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ধীরে ধীরে গড়ে উঠবে। অল্প অল্প করে ইসলামের বিধি-বিধান তাদের মন-মগজে খোদাই হয়ে যেতে থাকবে । সাধারণ ওয়ায-নসিহতের পরিবর্তে সরাসরি কুরআন হাদীসের এরূপ নিয়মিত সামষ্টিক' অধ্যয়ন সন্তানদের চরিত্র গঠনে অধিকতর উপকারী । পরিবার-পরিজনের দীনি প্রশিক্ষণের কয়েকটি দিক ওয়াক্ফ করা অত্যন্ত জরুরী। তাদের যন-মানসিকতা, সু-আগ্রহ ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জানা দরকার এবং সে অনুযায়ী তাদেরকে পরামর্শ দান ও সঠিক গাইড করা খুবই ফলপ্রসূ কাজ। এভাবে তাদেরকে দীনের পথে অগ্রসর করা খুবই সহজ। একটু সতর্ক হলেই নারীরা এ ব্যাপারে অত্যন্ত দক্ষতার পরিচয় দিতে পারেন। তাদের সাথে হাসি-খুশী ও খোলা মন নিয়ে মেশা অত্যন্ত জরুরী । তাদের মধ্যে পারিপার্থিক দূষিত ছোয়াচ লাগলে তা হিকমতের সাথে কঠোরভাবে দূর করতে হবে, যাতে পরিবারের সবাই বুঝতে পারে যে, তারা কোন্ কাজে কতটুকু অগ্রসর হতে পারবে এবং কোন্ কাজ করতে পারবে আর কোন্ কাজ পারবেনা । তাদের প্রতিভার বিকাশে সহযোগিতা করতে হবে। ভাল কাজের প্রশংসা করতে হবে। ভাল. কাজে উৎসাহিত করতে হবে।

অন্যায় কাজে কঠোরতা অবলম্বন করতে হবে। ঘরের ইসলামী পরিবেশ সৃষ্টিতে পুরুষদের তুলনায় নারীদের দায়িত্ব অধিক । কেবল রান্না খাওয়ানোর ব্যবস্থা করাই তাদের কাজ নয় । অনেকের ঘরে একাজ তো পরিচারিকারাও করে থাকে, তাদের আসল কাজ হচ্ছে ভবিষ্যত প্রত্যেকের ঘরেই লালিত-পালিত হচ্ছে। সন্তানদের সুন্দর চাল-চলন, সৎ জীবন-যাপন, বিশ্বস্ত চরিত্র, কষ্ট সহ্যের অভ্যাস, বড়দের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, ছোটদের স্নেহ করা, আল্লাহর পথে খরচ করার জজবা, আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য এবং তাদের প্রতি মহব্বত এবং অন্যায় থেকে বিরত থাকার অনুভূতি বিভিন্ন পন্থায় ধীরে ধীরে কেবলমাত্র একজন মা-ই তার সন্তানদের অন্তরে একজন সতর্ক দীনদার মা-ই তার সন্তানদের আদর্শ মানুষ বানাতে পারেন। তিনিই সন্তানদের ভালো কাজে, ভালো কথায় উদ্বুদ্ধ করতে পারেন, মন্দ'কাজ, মন্দ কথা থেকে বিরত রাখতে পারেন। দান-সদকায় অভ্যস্ত করতে পারেন। ত্যাগ ও কোরবানীর শিক্ষা দিতে পারেন, বড় ভাই-বোনদেরসম্মান ও ছোট .ভাই. বোনদের: স্নেহ-আদর-করার তা'লীয়ে দিতে পারেন। নিয়মিত. নামাযে অভ্যস্ত করে তুলতে পারেন। কুরআন হাদিস থেকে ছোট. ছোট, সুন্দর কথা ও কাহিনী. শিখাতে পারেন, দীনের জন্যে সাহাবায়ে কিরাম ও অতীত বুযুর্গদের ত্যাগ ও কোরবানীর ঘটনারলী শুনাতে পারেন। মা সন্তানদের যা শিখাবেন তার বাস্তব জীবনও তারই প্রতি হওয়া দরকার । তার তুল-ক্রটির ব্যাপারে তাকে খুবই সতর্ক'থারুতে হবে । এমনি করে তার নিজেকে সান্তানের জীবনে শিক্ষক ও উদাহরণ হিসবে পেশ করতে হবে।

সন্তানদের প্রশিক্ষনে নারীর ভূমিকা

আমল দ্বারাই কথা প্রভাবশালী ও গ্রহণযোগ্য হয়ে থাকে এ কারণেই রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক মহিলার সন্তানকে নিজে মিষ্টি খাবার অত্যাস পরিত্যাগ করার আগ পর্যন্ত মিষ্টি খেতে নিষেধ করেননি। বাচ্চাদেরকে, এমন উপদেশ দেয়া তাদের প্রতি বিরাট যুলুম, পিতা-তা নিজেই যা আমল করেন না, এরূপ উপদেশ তো ফলপ্রসূ হতেই পারেনা। বরঞ্চ এর দ্বারা তাদের মধ্যেও মারাত্মক মোনাফেকী ভাব জন্ম নেয়ার

আশংকা থাকে। মহিলা সাহাবীদের রোঃ) নীতিও এরূপই ছিলো অর্থাৎ ভরা নিজেদের আমলী যিন্দেগী ছারাই সন্তানদের প্রশিক্ষণ দিতেন। ইসলাম-ভীদের-ঘরের মধ্যে কেবল কুরআন শরীফের পাতায়ই আবদ্ধ থাকত না, ররঞ্চ তাদের দেখতো। মহিলা সাহাবীগণ নিজেদের সম্ভানদেরকে, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া. করাতেন এবং ভালো ভালো নাম রাখতে সন্তানদের তারাই দীনি শিক্ষা প্রদান করতেন। যাপনের মিথ্যা মানদন্ড, কৃত্রিম. সম্মান ও ইয্যত এবং দুনিয়াবী মান মর্যাদার তোয়াক্কা না করা, হালাল উপার্জনে স্বামীকে সহযোগিতা করা, স্বামীর স্বল্প হালাল আয়ের উপর সন্তুষ্ট থাকা এবং স্বামীকে সন্তুষ্ট রাখা নারীদের এমন সব মহৎ গুণাবলী যা সব পুরুষের যাবতীয় মানসিক দুর্বলতা বিদূরিত হয়ে যায় এবং তার কর্মক্ষেত্রে সে তীব্র গতিশীল হয়ে উঠে । এসব গুণাবলী দ্বারাই বাতিলের বিরুদ্ধে হকের জিহাদে নারীরা সর্বাধিক অংশ গ্রহণ করতে পারে । এমন কতো ঘর আছে যেখানে স্ত্রী দীনদার হওয়া সত্ত্বেও পুরুষের ইসলামী চরিত্র নেই। অনেক স্বামী আছে যাদের স্ত্রীরা তাদের তুলনায় অধিক দীনদার। এরূপ ক্ষেত্রে নারীদের জিহাদের মর্যাদা আরো উচ্চতর। ও সুন্দর কর্ম পদ্ধতির মাধ্যমে তাদের স্বামীদের উপর অনায়াসে প্রভাব ফেলতে পারেন। পুরুষদের উপর প্রভাব ফেলার বিরাট ক্ষমতা ও যোগ্যতা আল্লাহ তায়ালা নারীদের দান করেছেন। এ ক্ষমতা ও যোগ্যতা যদি তারা সত্যিকারভাবে কাজে লাগান তবে নিজেরা বস্তুবাদী সভ্যতার অপরাধী প্রাবনে ভেসে যাওয়া তো দূরের কথা, বরঞ্চ তারা তাদের স্বামীদের জীবনের গতিধারা পাল্টে দিতে সক্ষম। স্বামীদেরকে বাতিলের বিরুদ্ধে হকের জিহাদে উদ্দীপ্ত করে তুলতে সক্ষম। স্বামীদের সংশোধনের এ কাজ তারা যতো সহজভাবে করতে পারেন, বাইরের কোনো সংস্কার আন্দোলনের বড় কোনো কর্মীর জন্যেও এতোটা সহজে সে কাজ করা সন্ভব নয়। বড় বড় গোমরাহ লোকেরাও তাদের পরিবার পরিজন খারাপ হয়ে চলুক তা চায় না। বরঞ্চ ভালো পথে চলুক তা-ই চায়। এ জিনিষটাকেও দীনদার মহিলারা কাজে লাগাতে পারেন। স্বামীর এ পছন্দটুকুকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে তারা ঘরের পরিবেশকে দীনদারী, খোদাভীতি, নেক ও কল্যাণমুখী করে গড়ে তুলতে পারেন। এভাবে তারা স্বামীর সংশোধনের- সুযোগ গ্রহণ করতে 'পারেন। আর যেখানে স্বামীর.

মধ্যে কোনো প্রকার ভাল প্রবণতা. থাকেনা, সেখানেও নারীদেরকে হিকমতের সাথে বুদ্ধি খাটিয়ে তাদের সংশোধনের পথ বের করার চেষ্টা করতে হবে। তারা কি পরিমাণ চেষ্টা করেছেন আল্লাহ সেটাই দেখবেন। এভাবে স্বামী ছাড়াও নিজের নিকটতম আত্মীয়-স্বজনের উপর প্রভাব ফেলার মাধ্যমে তাদেরকে দীনের পথে আনার চেষ্টা প্রতিটি নারীরই করা উচিত। মোট কথা, নিজেদের প্রভাব ও ঈমানী যোগ্যতার মাধ্যমে নারীরা গোটা ঘরোয়া পরিবেশকে সংশোধনের দিকে এগিয়ে নিতে পারেন। হাদিসভিত্তিক আলোচনা বৈঠক করলে সংশোধনের কাজ তরান্বিত হতে পারে।

ইসলামী সমাজ গড়ার আন্দোলনে নারী

ইসলামী বিপ্লব প্রতিটি মুসলিম প্রাণের একান্ত কামনা । এ বিপ্লব সাধনে নারীরা বিরাট ও প্রভাবশালী অবদান রাখতে পারে। ইসলাম আনুগত্য ও দাসত্বের বিধান আর আমরা সকলেই আল্লাহর অনুগত দাস। এ আনুগত্য ও দাসত্রে দায়িত্ব ও কর্তব্য ব্যাপক-যা সঠিকভাবে আদায় করতে না পারলে আনুগত্যের হক আদায় হওয়া সম্ভব নয়। আমাদের একজন মালিক আছেন। আমাদের উপর রয়েছে তার অনেক অনেক অধিকার । আমাদের প্রতি রয়েছে তাঁর নির্দেশ ও নিষেধাজ্ঞা। এ সবের আনুগত্য করে না চললে আমরা তার সন্তুষ্টি লাভ করতে পারবো না এবং পরকালের সফলতা অর্জন করতে পারবো না। শোকর মহান মালিকের! তিনি আমাদেরকে শুধুমাত্র তার বান্দাহই বানাননি বরং বন্দেগীর নিয়ম-কানুনও শিখিয়েছেন এবং আমাদের উপর তার কি কি অধিকার আছে তাও বলে দিয়েছেন। এক সন্দেহাতীত কিতাব প্রেরণের মাধ্যমে । তা তিনি চিরন্তনভাবে বান্দাহদের জন্যে হেফাজত করে দিয়েছেন। আজ দুনিয়ার সব মানুষই নবীদের সম্পর্কে জানে। তাদের শিক্ষা ও হিদায়াত সম্পর্কে জানার বিরাট সুযোগ রয়েছে। সমস্ত নবী মানুষকে একই পথের হেদায়াত দান কক্তরছেন। কুরআন-মজিদে সে হেদায়াত সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত রয়েছে। নবীদের শিক্ষাকে অসত্য বলতে পারে আজ এমন মানুষের সংখ্যা খুবই কম। কিনতু ‘‘সৃষ্টি যার হুকুমও তারই চলবে'_ এ স্বীকৃতির অভাবই আজ দুনিয়াকে সংকটের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এ যুগে আল্লাহর অস্তিত্বের সাথেই

শিরক করা হচ্ছে। বস্তুত আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে পরিবর্তন করার চাইতে বড় শিরক আর কিছু হতে পারে না।

আজ যখন দুনিয়ার মানুষ আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী জীবনযাপন না করে ভ্রান্ত পথে চলার পন্থা অবলম্বন করছে, তখন আল্লাহর অনুগত বান্দাহদের দায়িত হচ্ছে আল্লাহর বন্দেগী ও দাসতে নিজেদেরকে পূর্ণাংগভাবে নিয়োজিত করা এবং আল্লাহর অন্যান্য বান্দাদেরকেও এ পথে আনার চেষ্টা করা । এ কাজ যদি কেউ না করে, আল্লাহর বান্দাহ্রা যদি ভ্রান্ত পথে ধাবিত হয়, কেউ যদি তাদেরকে সীরাতে মুস্তাকীমের দাওয়াত না দেয় এবং আল্লাহর বান্দারা যদি গাফলতির ঘুমোঘোরে হাবুডুব খায় তবে এর চাইতে বড় দুর্ভাগ্য আর কিছু হতে পারে না। পক্ষান্তরে একদল লোক যদি পথভ্রষ্ট লোকদের সঠিক পথে আনার কাজে নিয়োজিত হয়, ঘুমন্ত মানুষদের জাগানোর কাজে আত্মনিয়োগ করে এবং সত্যের শ্লোগান নিয়ে ময়দানে অবতীর্ণ হয়-তবে এর চাইতে বড় সৌভাগ্য ও কর্তব্য পরায়ণতা আর কিছু হতে পারে না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন দেখলেন, দুনিয়ার মানুষ সত্য দীনকে ভুলে গিয়েছে। সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে এবং চরম গোমরাহীতে নিমজ্জিত হয়ে আছে, তখন তিনি আল্লাহর নির্দেশে সত্যের দাওয়াত পৌছানোর জন্যে নিজের জীবনকে ওয়াকৃফ করে দিলেন। তার দাওয়াতে কেবল পুরুষরাই লাব্বায়েক বলেনি, কেবল পুরুষরাই এগিয়ে এসে কালেমার ঝান্ডা হাতে নেয়নি, বরং বুঝে শুনে পূর্ণ অনুভূতির সাথে তারা এ পথে পা ফেলেছিলেন। আত্মীয়তা এবং সম্পদের কুরবানী দিয়ে তারা এদিকে এসেছিলেন। অতঃপর এ ময়দানে এসে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার সংঘামে ত্যাগ ও কুরবানীর দিক দিয়ে তারা পুরুষদের চাইতে পিছিয়ে ছিলেন না। দীনের জন্যে তারা ত্যাগ ও কুরবানীর যে উদাহরণ পেশ করেছিলেন মুসলিম উম্মাহ তা কখনো ভুলে যেতে পারেনা । শতাব্দীর পর শতাব্দী থেকে আজ আমরা অধঃপতনের চরম সীমায় এসে পৌছেছি। আর এই অধঃপতনের কারণ হচ্ছে এই যে, আল্লাহ্ ও তার রাসূলের বিধান আমরা মুখে মুখেই মেনে থাকি, কাজ-কর্মে এবং আমলে আমরা সে অনুযায়ী চলিনা। যে কিতাবকে আমরা আল্লাহর কিতাব বলে স্বীকার করি, তার

পবিব্রতা রক্ষার জন্যে আমরা জীবনও বাজী রাখতে প্রস্তুত হই বটে, কিন্তু আমাদের নফসের খাহেশাত দমনের এবং আল্লাহ্‌র বিধান অনুযায়ী চলার আমরা চেষ্টা করিনা । মুসলিম জাতির আচরণ বড়ই বিস্বয়কর। তারা আল্লাহর বিধানের পবিত্রতা রক্ষার্থে জীবন দিতে প্রস্তুত হয় অথচ নিজেরাই সে বিধানকে অমান্য ও পদদলিত করে। বস্তুত তাদের এ বিপরীতধর্মী আরচণের কারণেই মুসলমানরা আজ অধঃপতনের গভীরতম গহ্বরে নেমে এসেছে।

আম্বিয়ায়ে কিরাম এবং তাঁদের অনুসারীদের সালেহ লোকদের জীবনোদেশ্য এই ছিলো যে, আল্লাহর কালেমা বিজয়ী হোক এবং অন্য সকল কালেমা পরাজিত ও পদদলিত হোক । ইসলাম আল্লাহর সমস্ত বান্দাহকে তীর দাসতু ও আনুগত্যের দাওয়াত দেয়। আর বিশেষভাবে মুসলমানদেরকে তাদের সে দায়িত্ব ও কর্তব্যের দিকে ফিরে যেতে বলে, যা তারা পরিত্যাগ করেছে। সে মানব জীবনের সমস্ত বিভাগকে আল্লাহর আনুগত্যের অধীন করতে চায় । যেমন করে মানুষ এবং তার প্রতিটি অংগ-প্রত্যংগ আল্লাহর সৃষ্ট বান্দাহ বা দাস। তার কোনো একটি অংগ বা প্রত্যংগও আল্লাহর সৃষ্ট দাস হওয়ার ব্যাপারকে অস্বীকার করতে পারেনা। তেমনি করে মানব যিন্দেগীর প্রতিটি-বিভাগকেও আল্লাহর দাসত্বের অধীন করে দিতে হবে। ঘরে, বাজারে, বাজারে, দরবারে, কারবারে কোথাও সে স্বেচ্ছাচারী. হতে পারে না। সর্বত্রই সে তার শ্রষ্টা ও মালিকের দাস। তাই তার মিন্দেগীর প্রতিটি বিভাগকে তার মালিকের দাসত্ব ও বন্দেগীর অধীন করে দিতে হবে। ব্যক্তিকে তার ব্যক্তিগত জীবনে আর সমষ্টিকে তাদের সামষ্টিক জীবনে আল্লাহর বিধানের সামনে মাথা নত করে দিতে হুবে। ইসলাম মানব জীবনের পূর্ণাংগ পরিবর্তন ও বিপ্রুব চায়। কারণ বান্দাহর জীবনে খোদা ও শাসকের মধ্যে বিভক্ত হতে পারে না। বস্তুত মুসলিম জাতির ধ্বংস ও অধঃপতনের প্রকৃত কারণই হচ্ছে এটা যে, সে জীবনের বিভিন্ন বিভাগকে আল্লাহর বিধানের পরিবর্তে মানুষের তৈরী আইন দ্বারা পরিচালিত করে তার জীবনের মিশনকেই পরিবর্তন'করে দিয়েছে। বস্তুত বিশ্বজাহানের মালিকের বিধান থেকে বিমুখ হওয়াই সমস্ত অধঃপতনের মূল কারণ। মুসলিম জাতির ব্যক্তিগত ও সামষ্টিগত দায়িত্ব হচ্ছে এই যে, সে যে-পথকে সীরাতে মুস্তাকীম ও

পরকালে মুক্তির একমাত্র পথ বলে ঘোষণা দিয়েছে-গোটা জীবন সে নিজে এবং বিশ্ববাসীকে সে পথে চালানোর জন্যে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ থাকবে । প্রশ্ন হতে পারে, এ বিরাট পরিবর্তন ও বিপ্লবের কাজ ইসলাম কোন পন্থায় করতে চায়। এর জবাব হচ্ছে এই যে, ইসলাম মানুষের মন-মগজ ও আকীদাহ-বিশ্বাসের পরিবর্তন এবং সমাজ ও পরিবেশের সংস্কার সংশোধন যে পন্থায় করতে চায়-তাকে চারটি অধ্যায় ভাগ করা যায়। মূল কাজ হচ্ছে একটাই । অর্থাৎ মানুষের ব্যক্তি ও সামষ্টিগত জীবনকে আল্লাহর আনুগত্যের অধীন করে দেয়া। কিন্তু এ পর্যন্ত পৌছার জন্যে প্রশিক্ষণ ও অনুশীলনের যে পন্থা অবলম্বন করা হয়-তাকে চারটি মৌলিক অধ্যায়ে ভাগ করা যায়। সংশোধনের পহেলা অধ্যায় হচ্ছে এই যে, মহিলাদের মন-মগজকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করতে হবে। তাদের মধ্যে ইসলামের অনুভূতি জাগ্রত করে দিতে হবে। ইসলামের সঠিক ও যথার্থ জ্ঞান তাদের মন-মগজে পরিষ্কার করে গেঁথে দিতে হবে। এমনি করে ইসলাম ছাড়া অন্য সবকিছুর প্রতি তাদের অনাস্থা সৃষ্টি করে দিতে হবে। শতাব্দীর কুসংস্কার তাদের মধ্যে যেসব অনৈসলামী আকীদাহ-বিশ্বাস ও চিন্তাধারার জন্ম দিয়েছে তা তাদের মন-মগজ থেকে এক এক করে দূর করতে হবে। ইসলামী আদর্শের সঠিক চিত্র ও ইসলামের অট্টালিকার সুস্পষ্ট নকশা তাদের মগজে বসিয়ে দিতে হবে। কিভাবে ইসলাম তাদের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সমস্যাবলীর সমাধান করে তা তাদের কাছে পরিষ্কার করে তুলে ধরতে হবে। বর্তমান পাশ্চাত্য বস্তুবাদী সভ্যতার মোকাবিলায় ইসলামের কল্যাণ ও শ্রেষ্ঠতবকে যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করে দিতে হবে। এ জন্যে তাদের সরাসরি কুরআন হাদীসের জ্ঞানার্জনে উদ্‌্বুদ্ধ করতে হবে । আজ আল্লাহর রহমতে কুরআন-হাদীসের ব্যাখ্যা করে লেখা ইসলামী সাহিত্যের অভাব আমাদের দেশে নেই। মোট. কথা, মৌখিক আলাপ-আলোচনা, কুরআন-হাদীস ও ইসলামী সাহিত্য পড়ানো, সর্বোপরি চারিত্রিক নমুনা পেশ করার মাধ্যমে ব্যাপকভাবে ইসলামের কল্যাণ ও সৌন্দর্যের প্রতি মানুষকে ডাকতে হবে এবং তাদের চিন্তাকে পরিশুদ্ধ করতে হবে।

এ কাজের দ্বিতীয় অধ্যায় হচ্ছে এই যে, প্রথম পর্যায়ের কাজ দ্বারা যারা এবং এ জন্যে কিছু ত্যাগ তিতীক্ষারও মানসিকতা রাখেন তাঁদের সংঘবদ্ধ করতে হবে। নিজ নিজ এলাকা থেকে এরূপ মহিলাদের খুঁজে খুঁজে বের করতে হবে এবং তাদের সংগঠিত করতে হবে। এদের মধ্যে সংশোধন ও কুরবানীর দিক থেকে যে যতোটুকু অগ্রসর হয় তার যোগ্যতা অনুসারে তাকে ততোটুকু দীন প্রচারের দায়িত্ব দিয়ে সংগঠনকে অথসর করতে হবে। এ ভাবেই আগেও কাজ হয়েছে এবং আল্লাহর রহমতে বর্তমানেও এভাবেই কাজ হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে শুধু মহিলাদের সংগ্রঠিত করাই যথেষ্ট নয় । বরং সাথে সাথে তাদের যোগ্যতা অনুসারে উপযুক্ত নৈতিক, মানসিক ও দীনি প্রশিক্ষণও প্রদান করতে হবে। যাতে করে যে মহান উদ্দেশ্যে তাকে সংগঠিত করা হয়েছে তার পর্যান্ত যোগ্যতা সে লাভ করে। যে মহান সংগ্রামের সে সৈনিক তার বিজয়ের প্রয়োজনীয় গুণাবলী যেনো সে অর্জন করতে পারে। এ কাজের তৃতীয় অধ্যায় হচ্ছে এই যে, গোটা সমাজের সামগ্রিক সংস্কার সংশোধনের চেষ্টা ও সংগ্রাম অব্যাহতভাবে চালিয়ে যেতে হবে। সমাজের এমন কোনো শ্রেণী যেনো না থাকে যারা দাওয়াত পাওয়া থেকে বঞ্চিত থাকে । এমন কোনো সমস্যা যেনো না থাকে যার ইসলামী সমাধান পেশ করা না হয়। সমাজে এমন কোনো রন্ধ যেনো না থাকে যেখানে আন্দোলনের কর্মী দাওয়াত পৌছায়নি এবং সংশোধনের জন্যে সেখানকার মহিলাদের উৎসাহিত করেনি। এভাবে সর্বত্র সর্বস্তরের লোকদের নিকট পৌছতে হবে। প্রাচীন ও আধুনিক জাহেলিয়াত সম্পর্কে তাদের অন্তরে ঘৃণাবোধ সৃষ্টি করে দিতে হবে। মানব সমাজের সকল সমস্যার সমাধান যে কেবলমাত্র ইসলামই দিতে পারে তাদেরকে স্পষ্টভাবে সে ধারণা দিয়ে দ্বিতে হবে। ইসলামই.যে সব সমস্যার ‘‘মাস্টার কী'-সে অনুভূতি তাদের মধ্যে জাগ্রত করে তুলতে হবে ।-এমনভাবে ইসলামের স্বরূপ তুলে ধরতে হবে, যাতে করে মানুষ ইসলামের অনুশাসন মেনে চলতে অনুপ্রাণিত হয়। ইসলামী অনুশাসনে মানসিক শান্তি ও কল্যাণ লাভ এবং বরকতময় ইসলামী জীবন ব্যবস্থার উপর সন্তুষ্ট হয়।

ইসলামী সমাজ গঠনে নারীর অবদান

এটি একটি ঐতিহাসিক সত্য যে, মুসলিম নারীরা ইসলামের জন্য বড় বড় ত্যাগ ও কুরবানী পেশ করেছেন । এজন্য তারা ঘনিষ্ট সম্পর্ক ও আত্মীয়তার বন্ধনের ওপর ছুরি চালিয়েছেন, নিজ বংশ ও গোত্রের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন, বিপদাপদ সহ্য করেছেন এবং ঘরবাড়ী ছেড়েছেন। মোটকথা, যে স্বার্থই ইসলামের স্বার্থের সাথে সংঘাতমুখর হয়েছে তাকেই তাঁরা পদাঘাত ও প্রত্যাখ্যান করতে কোনো রকম দ্বিধা ও সংশয়বোধ করেননি । আল্লাহর সাথে তারা যে চুক্তি ও প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হয়েছিলেন তা পূরণ করার ব্যাপারে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তারা কোনো শিথিলতা প্রদর্শন করেননি। মক্কার প্রাথমিক যুগে যে সাহসী মানুষগুলো ঈমান এনেছিলেন, আম্মার ইবনে ইয়াসারের পরিবার তাদের মধ্যে অন্যতম । তাঁর মা ছিলেন আবু হুযায়ফা ইবনে মুগীরার দাসী । ইসলাম বর্জন করানোর জন্য তার ওপর সব রকমের নির্যাতন চালানো হচ্ছিল। এমনকি ন্যায় ও সত্যের আহ্বানে সাড়া দেয়ার অপরাধে আবু জাহেল বর্শার আঘাতে তাকে শহীদ করেছিল । কিন্তু সে তার দৃঢ়তা ও প্রতিজ্ঞায় কোনো ফাটল ধরাতে পারেনি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আহ্বানে সাড়া দানের কারণে কোনো ব্যক্তির এটিই ছিলো প্রথম শাহাদাতবরণ। হযরত উমর রা.-এর বোন ফাতেমা বিনতে খাত্তাব ঈমান গ্রহণ করলে হযরত উমর রা. তাকে এতোটা মারপিট করলেন যে, তিনি রক্তাক্ত হয়ে গেলেন কিন্তু তা সত্তেও মহান আল্লাহর সাথে তিনি ঈমানের যে অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়েছিলেন তাকে দুর্বল বা শিথিল হতে দিলেন না। আবু সুফিয়ানের ঈমান গ্রহণের পূর্বের একটি ঘটনা । তিনি মদীনায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাজির হলেন এবং নিজ কন্যা উম্মুল মুমিনীন উম্মে হাবীবা রা. -এর সাথেও সাক্ষাত করতে গেলেন। ঘরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিছানা পাতা ছিল। আবু সুফিয়ান সে বিছানার ওপর বসতে উদ্যত হলে উম্মে হাবীবা তা গুটিয়ে নিলেন। পিতার কাছে কন্যার এ আচরণ ছিলো অত্যন্ত বিস্ময়কর । তিনি জিজ্ঞেস করলেন আমার মর্যাদার উপযুক্ত নয় বলে তুমি তা গুটিয়ে নিলে, নাকি আমাকে এর ওপর বসার উপযুক্ত মনে করোনি ও মেয়ে জবাব দিলেন “এ তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়া সাল্লামের বিছানা । আপনি মুশরিক এবং অপবিভ্র। এ পবিত্র বিছানায় আপনাকে বসিয়ে আমি তা অপবিত্র করতে চাই না।”

কুরআন মজীদের নির্দেশ হলো, আল্লাহর দুশমন এবং মুসলমানদের রিরুদ্ধে যুদ্ধরত 'জাতি বা লোকদের সাথে ঈমানদারদের কোনো প্রকার সম্পর্ক রাখা উচিত নয় । একবার হযরত আসমা রা. -এর মুশরিক মা ফাতিমা বিনতে আবদুল উষ্যা মক্কা থেকে উপহার উপঢৌকন নিয়ে মদীনায় তার বাড়ীতে আসলেন। হযরত আসমা রা. মায়ের এ উপঢৌকন গ্রহণ করা তো দূরের কথা তাকে বাড়ীর ভেতর প্রবেশ করার অনুমতি দেয়ার আগে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করে পাঠালেন যে, আমি কি তাকে আমার বাড়ীতে অবস্থান করার অনুমতি দিতে পারি? সাথে সাথে তিনি এ কথাও জানতে চাইলেন যে, তার মা তার সাহায্য ও সহানুভূতি পেতে আগ্রহী । তাকে সহযোগিতা করা এবং তার সাথে উত্তম আচরণ করা কি আমার জন্য জায়েয? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন তোমার এ দুটি কাজই জায়েয । রাকীকা বিনতে আবু সাইফী রা. মক্কী যুগের অত্যন্ত নাজুক মুহূর্তে সত্যের ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন । কুরাইশরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হত্যার পরিকল্পনা. করলে তিনিই তীকে পূর্বাহ্নে সতর্ক করে দিয়ে বললেন রাতের অন্ধকারে আপনার ওপর আক্রমণ করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে। তাই এখন আপনি নিজেকে হেফাযতের ব্যবস্থা করুন। সুতরাং নবী স. রাতের মধ্যেই মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করলেন । এ মহিলা ঈমান গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তার ছেলে মাখরামা তখনও কুফরকে আঁকড়ে ধরেছিলো। আপন পুত্র। তাই বলে ঈমানদার মা পুত্রের এ বে-দীনি জীবনকে হাসিমুখে বরদাশত করে নিলেন না। মাতৃত্ ঈমানী আবেগকে পরাভূত করতে পারলো না। পুত্র মাখরামার ব্যাপারে তিনি কঠোর নীতি গ্রহণ করলেন এবং সেভাবেই কাজ করলেন ।

সামরীকক্ষেত্রে নারীর অবদান

ইতিপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি যে, ইসলামী শরীআত রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা ও হেফাযতের দায়িত্ব নারীর কাঁধে অর্পণ করেনি । কিন্তু তা সত্তেও দীনকে বুলন্দ ও উন্নতশির করার আকাঙ্ক্ষা তাকে যুদ্ধের ময়দানে এনে শত্রুর মুখোমুখী দাঁড় করে দিতো । পুরুষের পাশাপাশি সেও তখন কুফরের ঝাণ্ডাকে পদানত করার কাজে অংশ গ্রহণ করতো ।

এক. আনসারী মহিলা সাহাবা উম্মে আম্মারা রা. উহুদের যুদ্ধ ক্ষেত্রে পুরুষের মতো সাহসিকতা ও বীরত্ব প্রদর্শন করেছিলেন । সা'দ ইবনে রাবীর কন্যা উম্মে সা'দ তাকে তার এ কৃতিত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি তা সবিস্তারে এভাবে বর্ণনা করেন আমি মুজাহেদীনের সেবা ও সহযোগিতার জন্য খুব সকালেই যুদ্ধ ক্ষেত্রে গিয়ে পৌছি। প্রথমে মুসলমানরাই বিজয় লাভ করলো । কিন্তু পরে এ অর্জিত বিজয় হাতছাড়া হয়ে গেলে তারা বিশৃঙ্খল ও ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়লো । তখন আমি নবী সা. -এর কাছে গিয়ে তাকে রক্ষার জন্য তীর ও তরবারী চালাতে থাকলাম । এমনকি শেষ পর্যন্ত আমার ওপর শত্রুর আঘাত এসে পড়লো । উম্মে সা'দ বর্ণনা করেছেন, আমি তার কাধের ওপর গভীর ক্ষতচিহ্ন দেখে জিজ্ঞেস করলাম কে আপনাকে এমন কঠিন আঘাত করেছিল? তিনি বললেন এ আঘাত করেছিল ইবনে কিমআহ। আল্লাহ তাকে ধ্বংস করুন; পরাজিত হয়ে মুসলমানরা নবী সা. –এর আশপাশ থেকে যখন সরে পড়লো তখন সে চিতকার করতে করতে এগিয়ে আসলো বললো, মুহাম্মদ (সা.) কোথায়? এ যুদ্ধে সে বেচে গেলে আমার রক্ষা নেই। তার জীবিত থাকা আমার জন্য ধ্বংস ও মৃত্যুর শামিল। একথা শুনে আমি নিজে, মুসআব ইবনে উমায়ের রা. এবং আরো কয়েকজন সাহাবা রা. তার মোকাবিলা করলাম । আমরা ক'জনই নবী সা. -এর পাশে দৃঢ় অবস্থান নিয়েছিলাম। সম্মুখ মোকাবিলার এ মুহূর্তেই সে আমার ওপর আঘাত করে। সে আঘাতের ক্ষত চিহ্নই তুমি দেখতে পাচ্ছ। তরবারি দিয়ে আমিও তাকে কয়েকটি আঘাত করলাম। কিন্তু আল্লাহর দুশমন দু' দুটি লৌহবর্ম দ্বারা তার দেহ সুরক্ষিত রেখেছিল।

সরকারী কাজে নিয়োজিত ব্যাক্তিদের উপদেশ দান ও ফলাফল

সমালোচনা ও সহযোগিতা কেবল তখনই উপকারী ও ফলপ্রসূ হতে পারে যখন তার পেছনে সদুদ্দেশ্য ও কল্যাণকামিতার মানসিকতা কার্যকর থাকে । কারো কাজের সমালোচনা করা হোক বা সমর্থন ও সহযোগিতা করা হোক উভয় অবস্থায় ব্যক্তিগত লাভ লোকসম্মুখে উদ্দেশ্য না থাকা উচিত। তা না হলে সহযোগিতা করাতে যেমন কোনো উপকার হয় না তেমনি প্রত্যাখ্যান বা প্রতিরোধেও কোনো উপকার পাওয়া যায় না। মুসলিম নারী সমাজ যা কিছু বলেছেন ও করেছেন তা ব্যক্তিগত স্বার্থের উর্ধে উঠে নিছক ইসলামী জীবন বিধান ও রাষ্ট্রের স্বার্থেই বলেছেন এবং করেছেন। ইসলামী জীবন বিধানের লাভ ও ক্ষতির প্রতি লক্ষ্য রাখা তার জন্য সব রকমের ত্যাগ ও কুরবানী এবং সর্বাপেক্ষা কঠোর ও প্রাণান্তকর পরিস্থিতিতে দৃঢ়তা মুসলিম নারীর এমন একটি গুণ বা বৈশিষ্ট্য যা তার সততা ও বিশ্বাসযোগ্যতাকে সবরকম সন্দেহের উর্ধে তুলে ধরে এবং কেউ-ই তাকে ইসলামী বিধান ও তার ঝাণ্ডাবাহীদের দুশমন ও বিশ্বাসঘাতক প্রমাণ করতে পারেনি । সে ব্যক্তি ও সমষ্টির স্বার্থে যে পদক্ষেপই গ্রহণ করেছে তাকে ব্যক্তিগত স্বার্থ এবং প্রবৃত্তির খায়েশ বলে অভিহিত করা হয়নি ; বরং তাকে সততা ও নিষ্ঠাপূর্ণ চেষ্টা-সাধনা মনে করে অভিনন্দন ও স্বাগত জানানো হয়েছে। সাধারণ মানুষ তো বটেই রাষ্ট্রের দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গও তার সমালোচনা ও উপদেশকে সম্মানের চোখে দেখেছে এবং তা থেকে উপকৃত হয়েছে। “যে ব্যক্তি মানুষকে অসন্তুষ্ট করে হলেও আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে (মানুষ তার কোনো ক্ষতিই করতে পারে না। কারণ) আল্লাহ তাআলা তাকে মানুষের ক্ষতি থেকে রক্ষা করেন। কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহর অসন্তুষ্টি উৎপাদন করে হলেও মানুষের সন্তুষ্টি কামনা করে আল্লাহ তাকে মানুষের হাতেই সোপর্দ করে দেন। (আর সেক্ষেত্রে মানুষ যেভাবে চায় সেভাবে সে সরকার পরিচালনা করে)। এক সময়ের ঘটনা । হযরত উমর রা. কোথাও যাচ্ছিলেন । পথে খাওলা বিনতে সা'লাবার সাথে তীর সাক্ষাত হলে তিনি হযরত উমর রা. -কে উপদেশ দিতে শুরু করলেন। উমর! এক সময় ছিল, যখন আমি তোমাকে উকাযের মেলায় দেখেছিলাম । তুমি ডাণ্ডা হাতে ছোট ছোট বাচ্চাদের ধমকাতে ও ভয় দেখিয়ে

বেড়াতে । সে সময় তুমি ছিলে খুব ছোট । অল্প বয়সের কারণে লোকে তোমাকে উমায়ের বলে ডাকতো । এরপর (খুব দ্রুত তুমি যৌবনে উপনীত হলে আর) লোকেরা তোমাকে উমর বলে ডাকতে শরু করলো । এ অবস্থায়ও খুব বেশীদিন যায়নি। এখন তোমাকে আমীরুল মু'মিনীন বলে সম্বোধন করা হয়ে থাকে। (চিন্তা করে দেখো, মহান আল্লাহ তোমাকে কোথায় থেকে কোথায় পৌঁছিয়েছেন। এখন তাই জনসাধারণের সাথে তোমার স্বভাবগত কঠোর আচরণ করো না। বরং) জনসাধারণের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো। মনে রেখো, যে ব্যক্তির মনে আল্লাহর আযাবের ভয় থাকে সে কিয়ামতকে দূরে মনে করতে পারে না। আর যার মনে মৃত্যুর ভয় আছে (সে বেপরোয়া ও লাগামহীন জীবন যাপন করতে পারে না)। সে বরং সবসময় নেকী করার সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার ভয়ে ভীত থাকে। সে সময় হযরত উমর রা.-এর সাথে ছিলেন জানদরদী আবদী। তিনি খাওলাকে বললেন তুমি তো দেখছি আমিরুল মু'মিনীনকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত উপদেশ দিতে শুরু করলে। হযরত উমর রা. তীকে বাধা দিয়ে বললেন ও তাকে বলতে দাও। তুমি কি জানো না, তিনি খাওলা বিনতে সা'লাবা। একবার হযরত উমর রা. বললেন মোহরানার পরিমাণ কম করে নির্ধারণ করো । এক মহিলা এর প্রতিবাদ করে বললেন একথা বলার অধিকার তোমার নেই। কারণ, কুরআন বলছে “তোমরা যদি স্ত্রীদেরকে মোহরানা হিসেবে অঢেল অর্থও দিয়ে থাকো তাহলে তা থেকে সামান্য পরিমাণ অর্থও ফেরত নেবে না।” এ থেকে জানা যায় যে, মোহরানার পরিমাণের কোনো নির্দিষ্ট সীমা নেই। হযরত উমর রা. তীর ত্রুটি স্বীকার করে বললেন একজন মহিলা উমরের বিরুদ্ধে বিতর্কে জয়লাভ করলো । হযরত আলী রা. তার খিলাফত যুগে বিরোধীদের সাথে যুদ্ধের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে মদীনার একজন গুরুতৃপূর্ণ ব্যক্তিত্ব আবদুল্লাহ ইবনে উমায়ের কামীল নাখয়ীকে তীর পক্ষে কাজ করার জন্য আহ্বান জানালেন। তিনি বললেন, আমি মদীনারই একজন অধিবাসী । মদীনাবাসীগণ যদি আপনার এ সিদ্ধান্তের পক্ষে কাজ করেন তাহলে আপনার সহযোগিতা করতে আমার কোনো দ্বিধা-দন্দব থাকবে না। অন্যথায় আমি অক্ষম । এরপর তিনি ওমরাহ আদায়ের উদ্দেশ্যে মক্কা রওয়ানা হলেন। যাত্রার প্রাক্কালে হযরত আলী রা. –এর কন্যা উম্মে

কুলসূম রা. -কে তিনি বললেন আমি যুদ্ধে শরীক হতে পারছি না। তবে অন্য সব ব্যাপারে হযরত আলী রা. -এর আনুগত্য করে যাব । ইতিমধ্যে গুজব ছড়িয়ে পড়লো যে, তিনি সিরিয়া রওয়ানা হয়ে গেছেন। এ খবর শুনে হযরত আলী সিরিয়া পৌছার আগেই তাকে গ্রেফতার করার সিদ্ধান্ত নিলেন। সুতরাং এ বিষয়ে যে মুহূর্তে তিনি যোদ্ধাদের নির্দেশ দিচ্ছিলেন খবর পেয়ে ঠিক সে মুহুর্তে তার কন্যা উম্মে কুলসূম রা. এসে হাজির হলেন। তিনি বললেন আবদুল্লাহর ব্যাপারে কঠোরতা অবলম্বন করবেন না। আপনাকে তার সম্পর্কে যা বলা হয়েছে বাস্তব অবস্থা তার সম্পূর্ণ বিপরীত। আমি তার জামিন হচ্ছি। তিনি আপনার বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন না। হযরত আলী রা. উম্মে কুলসূমের দেয়া এ খবর এবং আবদুল্লাহ সম্পর্কে তার মতামতের ওপর আস্থা স্থাপন করে এত বড় গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে নিজের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করলেন এবং যোদ্ধাদের অভিযান বাতিল করলেন।

ইসলামী সমাজ মুসলমান নারীর ওপরে বহু রাজনৈতিক ও সামাজিক দায়িত্ব অর্পণ করেছিল। আর মুসলমান নারীও নিজের পারিবারিক দায়িত্বসমূহ পালন করার সাথে সাথে এসব দায়িত্ব পালনের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। এসব ঘটনাবলী অকাট্যভাবে তা প্রমাণ করে।

References:

https://m.somewhereinblog.net/mobile/blog/nurubrl/30308358

ইসলামী বিপ্লবের সংগ্রাম ও নারী – ডঃ সাইয়েদ আস আদ গীলানী

ইসলামী সমাজে নারী – সাইয়েদ জালালুদ্দিন আনসার উমরী

এই থিসিস পেপারটি একটি ইন্টারন্যাশনাল জার্নালে পাবলিশ করা হয়েছে।

ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল লিংকঃ https://www.academia.edu/110786825/